ক. সাহিত্য - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধ অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনা করো

Dr. Mrinal Birbanshi
Assistant Professor, Department of Bengali
Vijaygarh Jyotish Ray College

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জিজ্ঞাসা (যা রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব নামে সুবিদিত) আলোচিত হয়েছে তাঁর 'সাহিত্য' , 'সাহিত্যের পথে' , 'আধুনিক সাহিত্য' , 'সাহিত্যের স্বরূপ' ও 'পঞ্চভূত' মুখ্যত এই কয়টি গ্রন্থে । তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলির একটি প্রায় আরেকটির পরিপূরক। সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী , সৌন্দর্যবোধ , সৌন্দর্য ও সাহিত্য , সাহিত্যের বিচারক (সাহিত্য) প্রভৃতি প্রবন্ধে একটি ধারণা দিয়েছেন । এই প্রসঙ্গে আমরা 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি ।

আমাদের সামনে পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রসারিত হয়ে আছে । এখানে ভালোমন্দ, মুখ্য ও গৌণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে । প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্য এই জগতে প্রত্যক্ষগোচর । কিন্তু সেই জগৎ যখন আমাদের মনে প্রবেশ করে , তখন তা রূপান্তরিত হয় । আমাদের নানা অভিজ্ঞতা ও বিচিত্রভাবের স্পর্শে যা স্থূল বাস্তব, তা মানসিক হয়ে ওঠে । আমাদের প্রীতি ও বিদ্বেষ , ভীতি ও বিস্ময়, সুখ ও দুঃখের ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়ায় হৃদয়বৃত্তির বিচিত্ররসে বাইরের জগৎ এক নতুন রূপ ধারণ করে। স্বভাবতঃ আমরা জগৎকে আমাদের চেতনার স্পর্শে মানসিক ও মানবিক করে নিই :

'' এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই''

যাদের হৃদয়বৃত্তির জারকরস পর্যাপ্ত নেই , তারা জগৎকে বস্তু -সীমার বাইরে উপলব্ধি করতে পারে না । তাঁদের চেতনার রঙে জগৎরূপ অহল্যার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয় না । জড় প্রকৃতির এমন দুই একজন লোক আছে, যাদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য খুবই সীমিত । তারা এই জগতে বাস করেও প্রবাসী। হৃদয়ের সংকীর্ণ জানলা দিয়ে তারা বিশ্বকে দেখতে পায় না । যারা আসলে ভর্তৃশাপে বিড়ম্বিত ।পক্ষান্তরে সংবেদনশীল , কল্পনাপ্রবণ , সৌভাগ্যবান ব্যক্তি অনেক থাকেন যাদের কাছে প্রকৃতির জগৎ থেকে আসে আমন্ত্রণ ।এই পৃথিবীতে , 'যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি' তা তাদের বাঁশিতে কম্পিত মূর্ছনা সৃষ্টি করে । অতএব , ভাবুকের কাছে বাইরের জটিল ও পারম্পর্য বিছিন্ন জগৎ থেকেও হৃদয়ের অধিগত মানসিক জগতের আকর্ষণ অনেক বেশি । সংবেদনশীল মানব মন যতখানি বাইরের জগৎকে আত্মসাৎ করে নিতে পারে , তা ঠিক ততখানি সত্য ও সার্থক হয়ে ওঠে।

বাইরের জগৎ নানা সুরে কথা বলে , কারণ সুন্দর ও অসুন্দর ,প্রিয় ও অপ্রিয়ে মিলে এই প্রত্যক্ষগোচর জগৎকে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় করে রেখেছে ।যে জগৎ বাইরের , তা অত্যন্ত পুরাতন । কিন্তু যুগে যুগে কবিগণের অনুভূতি , মন মনীষার স্পর্শে, হৃদয়ের সংযোগে তা নিত্য নবীন হয়ে কাব্যে প্রতিভাত হয় ।তাই জগৎ ও জীবনের সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হয়ে চলেছে । কিন্তু এই যে মানস জগৎ, যা বাস্তব জগতের নব প্রকাশ ও রূপান্তর , তা বাইরে প্রকাশিত হাবার আকাঙ্ক্ষা রাখে । মানসজগৎ চিরদিনই সৃষ্টি হয়ে চলেছে , কিন্তু তাকে রূপের সীমায় প্রকাশ করতে না পারলে তা হয় অকৃতার্থ। আমরা হৃদয়ে যা গভীর ভাবে অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে চাই ।তাই চিরকালই সাহিত্য রচনার প্রবল আবেগ মানুষের মধ্যে অনুভূত হয় :

''হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল । তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।''

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় প্রধান হয়ে ওঠে ।প্রাবন্ধিক সেক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করেছেন এইভাবে :

'' সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয় । প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি , দ্বিতীয় , তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা ।''

অর্থাৎ একটি হলো সাহিত্য স্রষ্টা তাঁর হৃদয় দ্বারা জগৎকে কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছেন, অপরটি হলো, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে স্থায়ী রূপ দিতে পেরেছেন কিনা । কবির কল্পনা যত সার্বভৌম হবে ততই তাঁর রচনার গভীরতা আমাদের আনন্দদান করবে । হৃদয়ের ভাব অন্যের মনে উদ্রিক্ত করার জন্য কলা-কৌশলের সাহায্যের প্রয়োজন হয় । পুরুষের বেশভূষা সাধারণ ও যথাযথ হলেই চলে, কিন্তু নারীর সাজসজ্জায় সুষমা ও পরিপাট্য অপরিহার্য। তাদের আচরণে আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই ।

সাহিত্যও সেইরকম নিজেকে সুন্দররূপে ব্যক্ত করার জন্য অলংকার ,ভাষা ও ছন্দের আশ্রয় নেয় ।সাহিত্যকে শুধু ব্যক্ত করলেই চলে না , রূপের মধ্যে রূপাতীত কে , বক্তব্যের মধ্যে অনির্বচনীয় তাকে প্রকাশ করতে হবে। যা রূপাতীত , অসীম ও অনির্বচনীয় তাকে নিরলংকৃত দর্শন-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ।অনেকখানি:

''নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলংকারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না ।''

ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রকাশ করার জন্য সাহিত্য, চিত্র ও সংগীত -এই প্রধান দুই উপকরণকে গ্রহণ করে থাকে । প্রাবন্ধিক স্পষ্টতই এক্ষেত্রে এইরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন :

'' অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ ।চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে । চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ ।''

ভাষায় যে ভাবকে প্রকাশ করা যায় না, তা চিত্রে সহজে তুলে ধরা যায় । বৈষ্ণব কবি বলরাম দাস লিখেছেন 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়' এর মাধ্যমে চিত্তের ব্যাকুলতা আশ্চর্য রূপ লাভ করেছে । প্রসঙ্গত আমরা একবার কবির 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'পুরস্কার' কবিতার উল্লেখ করতে পারি , যেখানে চিত্রের মাধ্যমে অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করেছেন :

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি ,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশ-ভালে
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার -ধূলিজালে ।

আর কথায় আমরা যার নাগাল পাই না সুরই ছুঁয়ে দিতে পারে চরণ। কথা জিনিসটা প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ , আর সংগীত আমাদের প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে দিতে পারে অনেক দূর ।বস্তুতঃ বাইরের প্রকৃতি ও মানব চরিত্র মানুষের মনে সর্বদা যে রূপ ধারণ করেছে , যে সুর সৃষ্টি করছে , ভাষায় রচিত সেই চিত্র ও গানই সাহিত্য ।

সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধের উপান্তে এসে প্রাবন্ধিক নানাবিধ যুক্তি -প্রতিযুক্তির অবসান ঘটিয়ে মূলত এটা বলেছেন :

'' এইবার আমাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় সাহিত্যের বিষয়

মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র ' '

সাহিত্যের ধর্ম হলো বাস্তব পৃথিবীকে মানসিক ও মানবিক করে তোলা । জঠরের জারকরস যেমন খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক করে শক্তি আহরণ করে , তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারকরসে বাইরের জগৎ অন্তরের হয়ে যায় । চেতনার স্পর্শে যা নিতান্ত জড়বস্তু তা সুন্দর হয়ে ওঠে । মানব জগৎ জানায় সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য , ভালো-মন্দের ব্যবধান ।এ নিছক সংবাদ দেয় না , তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে না , রসের পাত্রে তত্ত্বকে পরিবেশন করে । মানবহৃদয় চিরকাল নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে । এই প্রকাশের নাম সাহিত্য ।

কেবলমাত্র মানুষের হৃদয়কে যে সাহিত্যে ব্যক্ত করা হয় তাই নয় , মানবচরিত্রও আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্ত হয় । এই মানবচরিত্র সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের সীমা নেই, কিন্তু সে অন্তরময় বলে অন্তর মেশালে তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবচরিত্র স্থির নয় , সুসংগত ও নয় ।তার মধ্যে নানা স্তর আছে , বিভাগ আছে । এ কোথাও প্রকাশিত , কোথাও বা অপ্রকাশের আবরণে ঢাকা । এ সদা চঞ্চল ,পরিবর্তনশীল।এর অন্দরে বাইরে অবারিত গতিবিধি সহজসাধ্য নয় । এ ব্যতীত এর লীলা এত সূক্ষ্ম ,অভাবনীয় ও আকস্মিক যে , তাকে সম্পূর্ণরূপে জানা ও আয়ত্ত করা কঠিন । মহৎ কবিগণের কাব্যে মানব-জীবনের সুসঙ্গত প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

মানবহৃদয়ও সাহিত্যে আপন অন্তরের আনন্দ ও ঐশ্বর্যকে ব্যক্ত করার, সৃজন করার প্রয়াস করছে । মানবহৃদয়ের প্রকাশের এই যে প্রচেষ্টা , কবিগণ তার উপলক্ষ্য মাত্র। ভগবানের সৃষ্টি প্রকৃতির ও মানবজীবনের সৌন্দর্যকে নিয়ে উৎসারিত । কিন্তু সৌন্দর্যপ্রকাশ সাহিত্যের উপলক্ষ্য মাত্র ,উদ্দেশ্য নয় । হ্যামলেট বা ওথেলোর চিত্র মানবহৃদয়ের প্রকাশ ।বিশ্বের নিঃশ্বাস আমাদের চিত্তে রাগিনী বাজাচ্ছে। সাহিত্য তাকেই স্পষ্ট করে প্রকাশের প্রয়াস করছে । এই যে সাহিত্য তা -

''ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে , তাহা দৈববাণী ।''

বাইরের জগৎ যেমন তার ভালো -মন্দ, অসম্পূর্ণতা নিয়ে ব্যক্ত হবার প্রয়াস করে , মানুষের বাণীও সেইরকম হৃদয় থেকে সুসম্পূর্ণরূপে বের হবার জন্য নিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছে। সাহিত্যিক যা সৃষ্টি করেন তা দৈব প্রেরণার বশে। যাকে ইংরেজিতে ইনস্পিরেসন বলে ।

মানবহৃদয়কে জানতে পারলে ,তার অতলান্ত রহস্যের পরিচয় পেলে , মানবচরিত্রকে প্রকাশ করা সহজ হয়ে পড়ে । প্রাণের রঙ্গভূমিতে মানুষ আবির্ভূত হলো অনেক পরে । সে তার চৈতন্যের আলোয় জড় বিশ্বকে জয় করেছে । পৃথিবীজুড়ে চলেছে মানুষের চৈতন্য প্রকাশের পালা । স্রষ্টার ধর্ম হলো এই মানবচৈতন্যকে প্রকাশ করা, তারা প্রকাশের বাধা অপসারিত করে দেওয়া -

পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পাশা
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমার আহ্বান যবনিকা সরাবার কাজে ,
এ আমার বিস্ময়।

সমগ্র আলোচনা শেষে তাই বলা যায় উপাদান নিয়ে সাহিত্য নয় , রসময় ভাষারূপ নিয়েই সাহিত্য ।যেখানে মানুষের সঙ্গে একত্রে থাকার ভাব ,যা দ্বারা মানুষকে স্পর্শ করা যায় , মানুষকে অনুভব করা যায় । যার তাগিদ অবশ্যই আন্তরিক ।তাই সাহিত্য হয়ে ওঠে মিলনের রূপকাঠি , তাই এখানে কবিমন যেমন মানব মনের সঙ্গে মিলন ঘটায় , তেমনি বিশ্বের সঙ্গেও ।যা সত্য , সুন্দর , মঙ্গলময়, আর এই সত্য 'অধিকতর সত্য' । এই

সমস্ত কিছুকে তুলে ধরার জন্য সাহিত্যিকের এই গুনগুলি সম্যক ধারাণা জরুরি হয়ে ওঠে - কল্পনা , হৃদয়বৃত্তি, বাহিরকে আপন, রচনাশক্তির নৈপুণ্য , প্রকাশক্ষমতা , মানবহৃদয় ও মানচরিত্রকে একাত্ম করার উদ্ভাবনী শক্তি।

সহায়ক গ্রন্থ:

১।রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ- হরপ্রসাদ মিত্র
২। রবীন্দ্রচর্যা- দেবীপদ ভট্টাচার্য
৩।রবীন্দ্রনন্দন তত্ত্ব- বিমলকুমার মুখ্যোপাধ্যায়